সংসদের কার্যকারিতা ও সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধতা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০)

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের নিয়মাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে"।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার দিনবদলের সনদ শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেছে: "জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেয়া হবে (৫.৩) ... একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে (৫.৪)"।

দিনবদলের সনদে অন্তর্ভুক্ত ২০২১ সালের জন্য প্রণীত রূপকল্পে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার হলো: "... সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে"। সংসদকে কার্যকর করার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পক্ষান্তরে, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে 'জাতীয় সংসদ' শিরোণামে যে সকল অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সেগুলো হলো:

- "সংসদ হবে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। সংসদকে একটি কার্যকর এবং অর্থবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিএনপি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সমাধানকল্পে সংসদে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার নীতি অনুসরণ করা হবে।
- সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যেই গঠন করা হবে এবং বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণকেও স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে।
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোনো দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না। কোনো সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে।
- যিনি স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হবেন, তিনি তার দলীয় পদ থেকে সাথে সাথে ইস্তফা দেবেন এবং সেই দলের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। বিরোধী দলের একজন মনোনীত সংসদ সদস্য ডেপুটি স্পিকার হবেন।
- নির্বাচনের পর সকল সংসদ সদস্য সরকার প্রদেয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একইভাবে ভোগ করবেন এবং নির্বাচনী এলাকার জন্য সরকারের কোনো ধরনের বরাদ্দে কোনো বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হবে না।
- সংসদে বিরোধী দল যাতে একটি সম্মানজনক এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, সে জন্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।"

এটি সুস্পষ্ট যে, জাতীয় সংসদ আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিতের ওপর দাঁড় করানোর জন্য জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা অতি অপরিহার্য। এটি আমাদের জাতীয় অঙ্গীকারও বটে। আমাদের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

সংসদকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তা

অধিকাংশ জাতীয় সমস্যা ও বিরোধ রাজনৈতিকভাবে সমাধান হওয়া আবশ্যক। এ সকল সমাধান দু'ভাবে হতে পারে, যার একটি হলো পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতার মাধ্যমে। সরকার ও বিরোধী দল এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সাথে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা করা সম্ভব। এ সকল আলাপ-আলোচনা হতে পারে আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক। জাতীয় সংসদ হতে পারে আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু। এটিই সাংবিধানিক পন্থা। এ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় এবং এর ভিত সুদৃঢ় (consolidate) হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর ও চলমান রাখতে হলে এর ভিতকে সুদৃঢ় করার কোনো বিকল্প নেই।

জাতীয় সমস্যা সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা হলো রাজপথ। অসংবিধানিক না হলেও, এটি একটি অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি। অসহযোগ, ধর্মঘট, হরতাল তথা আন্দোলন এ পদ্ধতির অংশ। এ পদ্ধতিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয় এবং অর্থনীতি পঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর মাধ্যমে সহিংসতা সৃষ্টি হতে এবং অনেক সময় অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এমন অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিণাম সাধারণত অশুভ হয়। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে এবং অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা দখলের পথ সুপ্রশস্ত হতে পারে। অতীতে যা আমাদের দেশে একাধিকবার ঘটেছিল।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিপক্কতা অর্জন করেছে, সেসব দেশে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা অনুপস্থিত। সেসব দেশে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং জাতীয় সংসদের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিরোধের সমাধান করা হয়। সেসব দেশে সরকার বিরোধী প্রতিপক্ষ ও জনগণের মতামতের প্রতি অনেক বেশি

শ্রদ্ধাশীল এবং বিরোধী দলও অনেক বেশি দায়িত্বশীল। তাই গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় করতে হলে আমাদেরকেও নিয়মতান্ত্রিক পথে চলতে হবে এবং জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ সালে প্রণীত তিন দলীয় ঐক্যজোটের 'যুক্ত ঘোষণা'য় আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এমনি অঙ্গীকারই ব্যক্ত করেছিল। তাদের অঙ্গীকার ছিল: "... অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা বদলের অবসান ঘটিয়ে সাংবিধানিক পন্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল ও হস্তান্তর নিশ্চিত করা। এজন্য আমাদের সংগ্রামের দাবির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা করা ... (তাই) জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ অব্যাহত রাখা হবে এবং অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোনো পন্থায়, কোনো অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।"

সংসদের দায়িত্ব

সুচারুরূপে তার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংসদ কার্যকর হয়। সংবিধান সংসদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে। মোটা দাগে চারটি কার্যক্রম আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। প্রথমত, আইন পাশ করা, আইনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনে এগুলো বাতিল করা। দ্বিতীয়ত, সংসদের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান করা, যাতে জনস্বার্থে যথার্থ আইন ও নীতি প্রণীত হয়। তৃতীয়ত, সরকারের আয়-ব্যয়ের সিদ্ধান্ত ও বাজেট অনুমোদন করা। চতুর্থত, সংসদীয় কমিটিগুলোর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সংসদের কার্যকারিতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। এছাড়া বৈদেশিক চুক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যেমন, দুদক) প্রতিবেদনও সংসদে উপস্থাপিত হওয়ার কথা।

আইন প্রণয়ন বলতে সাধারণত আইন পাশ-সংশোধন-বাতিল, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান এবং সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাকে বুঝানো হয়। সরকারের বাজেট অনুমোদনও সংসদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সংসদের একটি বড় দায়িত্ব সংসদ সদস্যদের নিজেদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদে সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সদস্যদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে"। জাতীয় সংসদের 'কার্যপ্রণালী-বিধি'র ২২তম অধ্যায় (ধারা ১৬৩-১৭৬) 'বিশেষ অধিকার' সম্পর্কিত। কারো কার্যক্রমের দ্বারা সংসদ কিংবা সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন হলে তা তাঁদের বিশেষ অধিকারের লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে।

সাধারণ নাগরিকরা যেমন তাদের বক্তব্য ও কার্যক্রম দ্বারা সংসদ ও সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করতে পারে (যেমন, সংসদ কর্তৃক তলব হওয়ার পর তাতে সাড়া না দেয়া কিংবা দলিল-দস্তাবেজ না দেয়া)। তেমনিভাবে সংসদ সদস্যগণের নিজেদের আচরণের মাধ্যমেও এ অধিকার ক্ষুন্ন হতে পারে। যেমন, তাঁরা যদি দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ান তথা অসদাচারণে (misconduct) লিপ্ত হন, যা জনসম্মুখে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা হানি ঘটাবে, তাহলেও সংসদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। ভারতসহ অনেক দেশেই অসদাচারণের অভিযোগে সংসদ সদস্যদেরকে সংসদ থেকে বহিষ্কারও করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করার এবং এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রদত্ত বরাদ্দ থেকে কমিশন গ্রহণ ইত্যাদি অভিযোগে ২০০৫ সালে ভারতীয় লোক ও রাজ্য সভার ১১ জন সদস্যকে একযোগে বহিষ্কার করা হয়। স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ছাড়াও, অসদাচরণের অভিযোগে তিরস্কার এবং সাময়িকভাবে বহিষ্কারের মাধ্যমেও সংসদ সদস্যদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয়। তাই নিজেদের সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও সংসদের কার্যক্রমের অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সংসদের কার্যকারিতা

উপরিউক্ত দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হলে সংসদে সকল সদস্যের উপস্থিতি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাই বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকলে সংসদকে কার্যকর বলা যায় না। দুভার্গ্যবশত, আমাদের দেশে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের একটি অপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে জনগণের ভোটে তাদেরকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার লক্ষ্যে নির্বাচিত সদস্যগণ শুধুমাত্র তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্বই উপেক্ষা করছেন না, এটি আমাদের পুরো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই জিম্মি করার সামিল। আমরা আনন্দিত যে, আমাদের বিরোধী দল বহুদিন অনুপস্থিত থাকার পর সংসদে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা আশাকরি যে, এর মাধ্যমে সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির অবসান ঘটবে, তা না হলে সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই জনগণ ভবিষ্যতে প্রশ্ন তুলবে।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের কার্যকারিতা নির্ভর করে প্রণীত আইনের মানের ওপর। মানসম্মত ও যথাযথ আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন মাননীয় সংসদ সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের খুব কম সংসদ সদস্যই এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তুতিতে সময় ব্যয় করেন। এমনকি অনেকের এ ব্যাপারে আগ্রহও নেই। তাই অনেকে আমাদের জাতীয় সংসদকে 'রাবার স্ট্যাম্পিং' প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেন। সংসদ প্রণীত আইনগুলোর দিকে তাকালেই এ অভিযোগের সত্যতা অনেকাংশে দৃশ্যমান। যেমন, নবম জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার আইনগুলোর মধ্যে অনেক গুরুতর অসামঞ্জস্য রয়েছে।

সংসদের কার্যকারিতা গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয় যদি সংসদের আইন জনস্বার্থের পরিবর্তে ব্যক্তি কিংবা কোটারী স্বার্থে প্রণীত হয়। এক্ষেত্রে আমাদের নবম জাতীয় সংসদের রেকর্ড বিশেষভাবে হতাশাব্যঞ্জক। কোটারী স্বার্থে আইনপ্রণয়নের নগ্নতম দৃষ্টান্ত হলো, বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রণীত উপজেলা আইন। এর মাধ্যমে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ উপজেলার ওপর তাঁদের কর্তৃত্বই শুধু প্রতিষ্ঠা করেননি, উপজেলা পরিষদের ওপর এমন কালাকানুন আরোপ করেছেন যে, তাঁদের অবহিত করা ছাড়া পরিষদের পক্ষে সরকারের সাথে সকল যোগাযোগই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোটারী স্বার্থে প্রণীত এ আইন সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, কারণ সংসদ সদস্যগণ উপজেলার জন্য "আইনানুযায়ী নির্বাচিত" নন (অনুচ্ছেদ ৫৯) – তাঁরা জাতীয় সংসদের জন্য নির্বাচিত।

আইন প্রণয়নের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সংসদকে অনেকগুলো নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের সংবিধানে অনেকগুলো বিষয়ে আইন প্রণয়নের কথা বলা হলেও, গত ৩৮ বছরেও তা বাস্তবে রূপদান করা হয়নি। যেমন, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের কথা বলা হলেও তা আজও করা হয়নি। এমনি আরও অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে।

সংসদে যদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিতর্ক না হয়, তা হলেও সংসদকে কার্যকর বলা যাবে না। বিরোধী দলের উপস্থিতি ছাড়া যেমন এ বিতর্ক যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়, বিরোধী দলের উপস্থিতিতেও তা নিশ্চিত করা যায় না। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন: মাননীয় স্পীকারের নিরপেক্ষতা, সরকারি দলের উদারতা ও সংসদ সদস্যদের যথাযথ প্রস্তুতি। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের ক্ষেত্রে এর অনেকগুলোরই অভাব রয়েছে। অতীতে অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই সংসদে আলোচনা করতে দেয়া হয়নি। এছাড়াও বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ যদি পরস্পরের প্রতি গালিগালাজ কিংবা নেতা-নেত্রীদের বন্দনায় নিজেদেরকে লিপ্ত রাখেন, তাহলেও সংসদ কার্যকারিতা অর্জন করে না।

সংসদীয় কমিটিগুলো সংসদের প্রাণ। এগুলোর মাধ্যমেই সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় – আমাদের সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন"। তাই কমিটিগুলোর সক্রিয়তার ওপরই সংসদের কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে। সংসদে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সদস্যরাই অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন।

আমরা আনন্দিত যে, সংসদীয় কমিটিগুলো এবার সংসদের প্রথম অধিবেশনেই গঠিত হয়েছে। এগুলো অনেক বেশি কার্যকারিতাও প্রদর্শন করছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে এমন ব্যক্তিরাও কমিটির সদস্য কিংবা সভাপতি হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাতীয় দৈনিকের অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী, বিধি লঙ্ঘন করে ১৫ জন সংসদ সদস্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন (দৈনিক প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০)। এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কমিটিগুলো সম্পূর্ণ নীরব। যেমন, ছাত্র রাজনীতির নামে যে অরাজকতা, নৈরাজ্য ও খুনাখুনি চলছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির পক্ষ থেকে সরকারের জবাবদিহিতা দাবি করার কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি তার এখতিয়ার বহির্ভুত কাজে লিপ্ত হয়েছে। যেমন, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দুদকের কমিশনারদের তলব করার উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভুত। সরকারের পক্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়, তারাই এর এখতিয়ারভুক্ত – যেমন, বাংলাদেশ বিমান, টেলিভিশন করপোরেশন, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন, বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির চতুর্থ তফসিলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের নাম লিপিবদ্ধ করা আছে। উপরন্তু, এই কমিটির সভাপতি দুদক কর্তৃক দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে দুদকের বিরুদ্ধে বিচারকের আসনে বসা ছিল প্রতিহিংসামূলক ও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়-নীতিবোধের পরিপন্থি।

সংসদ সদস্যদের নিজেদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের অতীতের কোনো সংসদই আগ্রহ প্রদর্শন করেনি। নবম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। যেমন, গণমাধ্যম কর্তৃক আমরা জেনেছি যে, একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটির তদন্তে সাবেক স্পিকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উদঘাটিত হয়েছে। এর মাধ্যমে নিঃসন্দেহে সংসদের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটির পক্ষ থেকে ব্যরিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হলেও, বিষয়টি দুদকে প্রেরণ করা ছাড়া সংসদ তার বিরুদ্ধে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। এর মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হলো যে, আমাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা গুরুতর অন্যায় করেও পার পেয়ে যেতে পারেন। আর সংসদ সদস্যরা নিজেরাও দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে।

জাতীয় সংসদ আমাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ১৬ কোটি জনগণের নেতা। তাই তাঁদের সততা ও ন্যায়নীতিবোধের মানদণ্ড অত্যন্ত উঁচু ও জাতির জন্য অনুকরণীয় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সম্প্রতিকালে আমাদের বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে গণমাধ্যমে কিছু প্রতিবেদন বেরিয়েছে, যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিধি লঙ্ঘন করে ১৫ জন সংসদ সদস্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি/সদস্যই হন নি, মিথ্যা হলফনামা দিয়ে ১৮ জন উত্তরায় প্লট নিয়েছেন (দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি, ২০১০)। শোনা যায়, আরো অনেকে আছেন যাঁরা এ ধরনের অসদাচারণের মাধ্যমে পূর্বাচলসহ অন্যান্য এলাকায় প্লট পেয়েছেন।

মিথ্যা বলা নৈতিক স্খলনজনিত গুরুতর অপরাধ, হলফ করে মিথ্যা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ। অনেকের ধারণা যে, যারা মিথ্যা হলফনামা দিয়েছেন, তাঁরা জনপ্রতিনিধি হওয়ার এবং মহান জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ তাঁরা আইন প্রণেতা হয়ে আইন ভঙ্গ করেছেন। আমরা হতাশ হয়েছি যে, মিথ্যা হলফনামা প্রদানকারীদের কেউই এখনো স্বপ্রণোদিত হয়ে পদত্যাগ করেন নি। আমরা আরও হতাশ হয়েছি যে, সংসদ ও সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে এখনও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। এমনকি দলও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশি ভারতে ২০০৫ সালে অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করার ভিডিও গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হলে ১১ জন সদস্য সংসদ থেকে বহিস্কৃত হওয়ার আগেই, তাঁদের অনেকেই নিজ দল কর্তৃক সাময়িকভাবে বহিস্কৃত হন।

অতীতে আমাদের সংসদ সদস্যগণ গাড়ি বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছেন। এবারও তাঁরা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ী পাচ্ছেন, যার মাধ্যমে সরকার কয়েক শ কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও তাঁরা "চাহিবা মাত্রই" আবাসিক এলাকায় নাম মাত্র মূল্যে প্লট পাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদেরকে প্লট প্রদানের কারণে বঞ্চিত দরখাস্তকারীদের "আইনের দৃষ্টিতে সমতার" অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৭) – যা একটি মৌলিক অধিকার – ক্ষুন্ন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণের ক্ষমতা কারুরোই নেই। এছাড়াও গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, সংসদ সদস্যদের বেতনভাতা ৮০ শতাংশ বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। আমাদের নাগরিকদের একটি বিরাট অংশ যেখানে প্রতিনিয়ত নুন আনতে পান্তা ফুরায়, সেখানে সংসদ সদস্যদের জন্য এমন ধরনের বিলাসী সুযোগ-সুবিধা কি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য? উপরন্তু, আমাদের সংসদ সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ী এবং তাঁরা বহু অর্থ সম্পদের মালিক।

সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে করণীয়

সংসদকে একটি কার্যকর ও দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে অনেকগুলো করণীয় রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ করণীয়গুলো হলো:

- সংসদ সদস্যদেরকে সংসদীয় কাজে নিবিষ্ট করা এবং তাঁদেরকে স্থানীয় উন্নয়ন কাজ থেকে দূরে রাখা;
- সংসদীয় কার্যক্রমে সর্বোচ্চ অবদান রাখার লক্ষ্যে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জনবল ও উপকরণ সহযোগিতা প্রদান করা;
- অনুমতি ব্যতিরেকে এক নাগাড়ে ৩০ দিনের বেশি সংসদ অধিবেশন বর্জনের কারণে সংসদ সদস্যপদ বাতিলের বিধানসম্বলিত আইন প্রণয়ন করা;
- সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকারকে কার্যকারিতা প্রদানের লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে একটি আইন প্রণয়ন করা। এমন আইন প্রণীত হলেই অসদাচারণের মাধ্যমে সংসদের সুনাম ও সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করার অভিযোগে যে কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে;
- সংসদ সদস্যদের জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করা। জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি ইতোমধ্যে এ ধরনের একটি প্রস্তাব বেসরকারি সদস্য বিল হিসেবে উত্থাপন করেছেন। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় লোকসভার একটি বিশেষ কমিটি লোকসভার সদস্যদের জন্য এ ধরনের একটি আচরণবিধির খসড়া প্রণয়ন করেছে। ভারতীয় মন্ত্রীসভার জন্যও একটি আচরণবিধি ঘোষণা করা হয়েছে;
- যে সকল সংসদ সদস্য মিথ্যা হলফনামা প্রদান করে অসদাচারণে লিপ্ত হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা;
- দিনবদলের সনদে অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা;
- দিনবদলের সনদে অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার প্রদান করা।

*****

"সংসদ সদস্য আচরণ আইন, ২০১০" বিলটি ১৪ জানুয়ারি, ২০১০ তারিখে জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি 'বেসরকারি সদস্যদের বিল' হিসেবে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন।

কি আছে এই বিলটিতে:

এই বিলটিতে মোট ১৫টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে:

ধারা ১: সংক্ষিপ্ত শিরোণাম;
ধারা ২: সংজ্ঞা;
ধারা ৩: সংসদ সদস্যগণের নৈতিক অবস্থান;
ধারা ৪: সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব;
ধারা ৫: স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য;
ধারা ৬: ব্যক্তিস্বার্থে আর্থিক প্রতিদান;
ধারা ৭: উপঢৌকন বা সেবা;
ধারা ৮: সরকারি সম্পদের ব্যবহার;
ধারা ৯ : গোপনীয় তথ্যের ব্যবহার;
ধারা ১০: বাক স্বাধীনতা;
ধারা ১১: সংসদ সদস্য বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করা;
ধারা ১২: পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহিষ্ণুতা;
ধারা ১৩: নৈতিক কমিটি ও আচরণ আইনের প্রয়োগ;
ধারা ১৪: আইন লঙ্ঘনের শাস্তি;
ধারা ১৫: নৈতিকতা কমিটির কার্যকাল।

এক নজরে *সংসদ সদস্য আচরণ আইন, ২০১০*

সংসদ সদস্যগণের নৈতিক অবস্থান

এই বিলের ৩নং ধারায় সংসদ সদস্যদের নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে সংসদ সদস্যগণ হবেন:
১। মানবিকতা ও অনুকরণীয় চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন; ২। দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বে অঙ্গীকারাবদ্ধ; ৩। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী; ৪। বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনার ধারক ও বাহক; ৫। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী; ৬। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সকল প্রকার সমাজবিরোধী অপরাধমূলক কার্যকলাপ হতে মুক্ত।

সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব

এই বিলের ৪নং ধারায় সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রস্তাবনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:

- সংসদ সদস্যরা কার্যপ্রণালীবিধি অনুযায়ী চলবেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজে কোনো সুপারিশ করতে পারবেন না।
- নিজের বা পরিবারের সদস্যরা আর্থিক বা বস্তুগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবেন না।
- তাঁরা এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত থাকবেন না, যাতে সংসদীয় দায়িত্ব প্রভাবিত হতে পারে।
- সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হলো জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে আইন প্রণয়ন করা এবং নির্বাহি বিভাগ যথাযথভাবে সে আইন পালন করছে কি-না, তা তদারক করা।

স্বার্থগত দ্বন্দ্ব ও আর্থিক তথ্য

এ ব্যাপারে বিলের ৫নং ধারায় বলা হয়েছে:
সংসদ সদস্যগণ নিজের বা অন্যের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে অবৈধ ও অসৎ পথ অবলম্বন করবেন না; সংসদ সদস্যগণ নিজের এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, আয় ও সম্পদের উৎস সংক্রান্ত তথ্য সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সংসদ শুরুর প্রথম অধিবেশনের মধ্যে প্রকাশ করবেন; সরকারি বা বেসরকারি খাতে কোনো প্রকার নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো সিদ্ধান্তে সুবিধা পেতে ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না; সরকারি ক্রয়-বিক্রয়, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারি নীতি-নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রভাব বা স্বার্থ অর্জন থেকে বিরত থাকবেন; বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার পথে কোনো প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করবেন না; সংসদ সদস্যগণ মানবাধিকার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হবেন; সংসদ সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসাবে দেশ ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুন্নকারী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন।

এই বিলের অন্যান্য দিকগুলো হচ্ছে
ব্যক্তিস্বার্থে আর্থিক প্রতিদান (ধারা-৬)

জনপ্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনে সংসদ সদস্যগণ জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে প্রাধান্য দিবেন এবং সংসদ সদস্যগণ আর্থিক প্রতিদান বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে সংসদ বা এর কোনো কমিটিতে কোনো বিষয় উত্থাপন, কোনো বিল বা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান অথবা প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না।

উপঢৌকন বা সেবা (ধারা-৭)
সংসদ সদস্যরা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যমানের উর্ধ্বে কোনো উপঢৌকন বা সেবা গ্রহণ করলে তা নৈতিকতা কমিটিকে অবহিত করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপঢৌকন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবেন এবং স্বার্থগত দ্বন্দ্বে অথবা সদস্যদের দায়িত্বপালনে প্রভাবান্বিত করতে পারে এমন ধরনের কোনো উপঢৌকন সদস্যরা অবশ্যই গ্রহণ করবেন না।

সরকারি সম্পদের ব্যবহার (ধারা-৮)
আইন, নীতিমালা ও বিধি অনুসারে সংসদ সদস্যগণ সরকারি সম্পদ এবং বিশেষ সুবিধা ভোগ করবেন। তবে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ কোনো অবস্থাতেই আর্থিক উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে তা ব্যবহার করবেন না।

গোপনীয় তথ্যের ব্যবহার (ধারা-৯)
সংসদ সদস্য হিসেবে তথ্য অধিকার আইন বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী জনগণকে জানানো যাবে না এমন কোনো গোপনীয় তথ্য অবগত হলে তিনি জ্ঞাতসারে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থে অবশ্যই তা ব্যবহার করবেন না।

বাক স্বাধীনতা (ধারা-১০)
সংসদ সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংবিধান ও কার্যপ্রণালীর বিধান সাপেক্ষে সংসদে বক্তব্য উপস্থাপন ও সার্বিক আচরণে গণতান্ত্রিক, মুক্তবুদ্ধি, সহনশীল ও বস্তুনিষ্ঠ, চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ অভিমতের প্রতিফলন ঘটাবেন।

সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুলপথে চালিত করা (ধারা-১১)
সংসদ সদস্যগণ অবশ্যই জ্ঞাতসারে তাদের বিবৃতি ও বক্তব্যের মাধ্যমে সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করবেন না। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল বক্তব্য দিয়ে থাকেন তবে স্বপ্রণোদিতভাবে যত দ্রুত সম্ভব তা সংসদীয় নথিতে সংশোধন করতে বাধ্য থাকবেন।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতা (ধারা-১২)
সংসদের পবিত্রতা, সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখতে সংসদ সদস্যগণ পরমতসহিষ্ণু হইবেন এবং ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, সংসদ অধিবেশনে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ করবেন এবং সংসদে আলোচনা বা বক্তব্য উপস্থাপনে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসামূলক বক্তব্য, অযাচিত সমালোচনা বা স্তুতি, কটু বা অশ্লীল ভাষা এবং অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি সচেতনভাবে পরিহার করবেন।

নৈতিকতা কমিটি ও আচরণ আইনের প্রয়োগ
এই আইনের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে সংসদে একটি সংসদীয় নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠনের কথা বলা হবে। এই কমিটির নাম হবে 'নৈতিকতা কমিটি'। এ বিলের ১৩ নং ধারায় এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সকল দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে ৯ জন সংসদ সদস্যের এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন সংসদের স্পীকার।

- যে কোনো ব্যক্তি কোনো সদস্যের ব্যাপারে কমিটির কাছে অভিযোগ দাখিল করলে কমিটি যুক্তিগ্রাহ্যতার বিচারে সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দাবি করতে পারবে।
- অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সংসদ সদস্য কমিটির যে কোনো নির্দেশ পালনের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন।

আইন লঙ্ঘনের শাস্তি
এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে এর প্রতিকার সম্পর্কে বিলটির ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে:
যে কোনো ব্যক্তি বিষয়টি ধারা-১৩ এ গঠিত কমিটির গোচরে আনতে পারবেন, অথবা; নৈতিকতা কমিটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এটি বিবেচনায় নিতে পারবে; কোন সংসদ সদস্য আইন লঙ্ঘন করলে নৈতিকতা কমিটি যেরূপ বিবেচনা মনে করবে সেরূপ শাস্তি সম্পর্কিত রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করবে।

নৈতিকতা কমিটির কার্যকাল
এই কমিটির কার্যকাল সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিলটির ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে:
কমিটি গঠন হতে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত এ কমিটির কার্যক্রম বলবৎ থাকবে; প্রতি বছর নৈতিকতা কমিটি তার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করবে। এক্ষেত্রে স্পিকার প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা ও জনসমক্ষে প্রকাশ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন; আচরণবিধি সংশোধনকল্পে কমিটি যেকোনো সময় সংসদে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারবে, তবে এরূপ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে।